রমাদ্বনের পাঠ

মূলঃ শাইখ আবু ইবরাহীম আল বুকাইরী (হাফিজহুল্লাহ)

অনুবাদঃ উস্তাদ আবু শামিল (হাফিজহুল্লাহ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা।	১
রমাদ্বনের অর্থ।	২
রমাদ্বন আগমনের সুসংবাদ।	৩
সিয়ামের হিকমাহ।	৫
সিয়ামের হাকিকত।	৭
শয়তানকে শিকলবন্দী করা।	৯
পরিপূর্ণ সিয়াম।	১১
আগেভাগে ইফতার ও দেরি করে সাহ্‌রী করা।	১৩
রমাদ্বনের কিয়াম।	১৫
কুরআন ও তার তেলাওয়াতের ফজিলত।	১৭
তাকওয়ার হাকিকত।	১৯
রাইয়ান নামক দরজা।	২২
আল্লাহর দ্বীনে সহজতা।	২৪
দোয়া ও এর ফজিলত।	২৬
হে ঈমানদারগন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দাও।	২৮
রমাদ্বনে ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহ।	৩০
এই যুগে মুসলিমদের অবস্থা।	৩৩
রমাদ্বনে আল্লাহর আনুগত্য বাড়িয়ে দেওয়া।	৩৫
রাসূল (সাঃ) এর জীবনযাপন।	৩৭

রমাদ্বনে উমরাহ। ৩৯
ইসলামে ওয়ালা ও বারাআহ। ৪১
রমাদ্বনের শেষ দশকের ফজিলত। ৪৩
ই'তিকাফ। ৪৫
ক্বদরের রাত্রি। ৪৭
আখেরাতে সফলতার জন্য দুনিয়াকে কাজে
লাগানো। ৪৯
পরিক্ষা। ৫২
তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমাদের
হাতের কামাই। ৫৪
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষন। ৫৬
নির্দিষ্ট দিনসমূহ। ৫৯
ফিতরের যাকাত। ৬১
রমাদ্বনকে বিদায় জানানো। ৬৩
তাকবীর ও ঈদের সলাত। ৬৫

অনুবাদকের আরজ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আলহামদুলিল্লাহ, রমাদ্বনের উপর লেখা শাইখ আবু ইবরীহম আল বুকাইরী (হাফিঃ) এর বইটির অনুবাদ শেষপর্যন্ত আলোর মুখ দেখলো। গত বছর অনুবাদের কাজ শেষ হলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুবাদটি প্রকাশের চাহিদা আমাকে যারপরনাই চমৎকৃত করেছে।

সাধারনত সিয়াম বা রমাদ্বনের উপর লেখাগুলো সবাই সাধারন লেখা হিসাবেই গ্রহন করেন। এর কারন হচ্ছে, বিষয়টির উপর লেখাগুলো প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। লেখক ভিন্ন হলেও বিষয়ের আলোচনা প্রায় কাছাকাছিই থাকে। কিন্তু এই সাধারন বিষয়টিও যে বাচনভঙ্গি ও আনুষঙ্গিক কারনে অসাধারন হয়ে যায় তার প্রমান হচ্ছে এই বইটি।

রমাদ্বন ও সিয়াম হচ্ছে বহুল চর্চিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। মুজতাহিদ ইমামগন থেকে শুরু করে সাধারন তালিবুল ইলমগন পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন। এর যৌক্তিতাও আছে বটে, যে জিনিস যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার চর্চা তত বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে কিছু কিছু লেখা সাধারন চর্চিত বিষয়টিকে অসাধারন করে তুলেছে। সেই অসাধারন লেখাগুলোর এটি একটি। এর অধ্যায়গুলো সাজানো হয়েছে রমাদ্বনের তারিখ অনুসারে, যা একটি ব্যাতিক্রমী বিষয়। এবং অধ্যায়ের শিরোনাম বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও লেখক যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, পাঠক বইটি পড়া শুরু করলেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আমার অনুবাদের সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যে এই বইটি অনুবাদ করতে আমার যতোটা ভালো লেগেছে তা অন্য ক্ষেত্রে হয়নি। বইটির পরতে পরতে সিয়ামের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো যেমন আলোচিত হয়েছে, জাগতিক দিক থেকেও যে সিয়াম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিয়াম কিভাবে ব্যাক্তি ও সমাজকে রত্নময় করে তোলে তার সুন্দরতম প্রক্রিয়াগুলো এতে আলোচিত হয়েছে। সর্বোপরি উন্নত সমাজ গঠনে সিয়াম ও রমাদ্বন মাসের ভূমিকাকে অনন্যসাধারন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা পড়ে পাঠকমাত্রই মুগ্ধ হতে বাধ্য হবেন ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে নিঃসংকোচে বলছি, অনুবাদ কখনই শতভাগ নিখুঁত হয়না। তবে এর ভালো হওয়ার হার অনুবাদকের দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। শুরুতেই বলে রেখেছিলাম যে, আমার অনুবাদের সংখ্যা খুবই কম, তাই অনুবাদক হিসেবে আমি নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন মনে করিনা। কিন্তু এই কাজগুলো যাদের করার কথা তাদের অনেকেই দূর্ভাগ্যজনকভাবে দ্বীনের এই মহান কাজে সতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন না করার কারনে আমার মত নালায়েক ব্যাক্তিদেরকেই অল্প সামর্থ্য নিয়ে এই মহান কাজে হাত দিতে হলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী রমাদ্বন দেখার সৌভাগ্য দান করবেন তাদের জন্য এই মাসের পরিপূর্ণ সৎব্যবহার করার তাওফিক কামনা করে আমার কথা এখানেই শেষ করলাম।

১৭ রজব ১৪৪০ হিজরী
২৪ মার্চ ২০১৯ খৃষ্টাব্দ

আবু শামিল

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

সিয়াম মানুষকে কামালাতের শীর্ষে নিয়ে যায়, তখন সে মুক্ত হয় প্রবৃত্তির গোলামী ও অভ্যাসের দাসত্ব থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সিয়ামকে ফরজ করেছেন একটি সুউচ্চ হিকমাতের জন্য, আর তাহচ্ছে মানুষ যেনো তাকওয়া অর্জন করতে পারে এবং শয়তানের কবজা থেকে বাঁচার কায়দা শিখতে পারে।

রোজাদার ব্যক্তি রিয়া ও মানুষের অসন্তুষ্টি অর্জনের আশংকা থেকে মুক্ত থাকে, যার কারনে রোজা হয়ে উঠে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন পবিত্রতার অন্যতম এক মাধ্যম।

হে আমার সাইম ভাই! আল্লাহ আমাদের সকলের সিয়াম কবুল করুন। এই লেখনীতে নতুন কিছু নাই, এতে আছে ঈমানদারদের জন্য রমাদ্বন মাস উপলক্ষ্যে কিছু আলোচনা মাত্র, যা সংক্ষিপ্তও বটে, যাতে করে সময়োপযোগী হয়। আর তা অবশ্যই আসরের পর।

হে আল্লাহ! রমাদ্বন মাসকে আমাদের নিকট নিয়ে আসুন ঈমান ও নিরাপত্তা, ইসলাম ও শান্তি এবং আপনার পছন্দনীয় আমলের তাওফিক সহকারে।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

রমাদ্বনের অর্থ

প্রাচীনকাল থেকেই মুজতাহিদগন উক্ত মাসটিকে “রমাদ্বন” নামকরনের কারন খুজে আসছেন। কেউ বলেন, রমাদ্বন একজন সৎলোকের নাম। নাবী (সাঃ) তার সম্মানার্থে তার নামেই এই মাসের নামকরন করেছেন। আবার কেউ বলেন, শরৎকালের আগে এই সময়ে رمضا নামের অতি উর্বর বৃষ্টি হয়েছিলো, সেখান থেকেই এই মাসের নাম রমাদ্বন নামকরন করা হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে رمضا দিয়ে সাধারনত অত্যন্ত উষ্ণ তাপমাত্রা সম্বলিত ভূমিকে বুঝায়, আর ঐ মাসটি ছিলো উষ্ণ তাই মাসটির নাম রমাদ্বন রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই মাসের ইবাদাত গুনাহখাতাকে জালিয়ে দেয় তাই এই নামকরন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আরবগন শাওয়ালের যুদ্ধ করার জন্য তার আগের মাসে তাদের যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করতো যাতে হারাম মাসের আগেই যুদ্ধ করতে পারে। ইত্যাদিসহ আরো অনেক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাগুলো এবং এর কারনগুলো নিয়ে যে-ই গবেষনা করবে সে এমন কিছু পাবেনা যা সুনিশ্চিত। বরং মধ্যমপন্থা হচ্ছে এই যে, রমাদ্বন হলো একটি নাম যা অন্যান্য মাস যেমন রজব, শাবান, অথবা শাওয়ালের মতো। আর নাম ব্যাখ্যা করা যায়না।

তবে যাই হোক রমাদ্বন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মাস, কারন এতে কুরআন নাযিল হয়েছে। এতে রয়েছে এমন একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এই মাসে সৎকাজের পুরষ্কার বহুগুনে বৃদ্ধি করা হয়। এমন আরো অনেক ফজিলত রয়েছে যা আল্লাহ ভালো জানেন।

১ম অধ্যায়ঃ রমাদ্বন আগমনের সুসংবাদ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد :

আল্লাহর বান্দাগন! নবী (সাঃ) তাঁর উম্মতকে রমাদ্বন মাস আসার সুসংবাদ দিতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন নবী (সাঃ) বলেছেন,"তোমাদের নিকট বরকতময় মাস রমাদ্বন এসেছে, এই মাসে রোজা রাখা ও কিয়াম করা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, এই মাসে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও অভিশপ্ত শয়তানদেরকে বেধে রাখা হয়। আল্লাহর কসম এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে এই রাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে" (আহমাদ, নাসায়ী- হাদিসটি জায়্যিদ পর্যায়ের)

রমাদ্বন মাস মুসলিমদের নিকট একটি সম্মানিত মাস যার মর্যাদা সকল মাসের চেয়ে উপরে এবং এর মাহাত্ম্য সারা বছরের চেয়ে বেশি। এটি এমন একটি মাস যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। "রমাদ্বন মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে" (বাকারাঃ ১৮৫)। এই মাসের রোজাকে আল্লাহ ফরজ করেছেন এবং এর কিয়ামকে নাবী (সাঃ) সুন্নাহ করেছেন। এই মাসেই মুসলিমগন উত্তম চরিত্রে ভূষিত হন।

সিয়াম একটি ইবাদাত যার অতি মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে তা স্পষ্ট করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ইমানদারগন! তোমদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো” (বাকারাঃ ১৩৮)। সুতরাং সিয়ামের লক্ষ্য হচ্ছে সেইসব মুত্তাকীদের দরজায় উন্নীত করা যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর জান্নাতের আশা করে তাই তারা গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ভালো কাজের প্রতি সচেষ্ট হয়। সিয়ামের উদ্দেশ্য এটাও যে, অন্তরের এমন পরিশুদ্ধতা অর্জন করা যাতে অন্তর আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়।

সিয়াম এমন এক ইবাদাত যা সম্মান, কামালাত, ইসতিকামাত, এবং সৎ আমলের দিকে সোপান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিয়াম হচ্ছে একটি চিকিৎসা যা, আত্মায় পুরো বছর যে রোগগুলো পয়দা হয় তার শিফা হয়ে আবির্ভূত হয়, যার কারনে আত্মা তখন আল্লাহ ভীতির দিকে ধাবিত হয় ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর বড়ত্বের দিকে ফিরে আসে, আর তখনই আত্মা আনুগত্যের প্রচেষ্টা করে।

আল্লাহর বান্দাগন! রমাদ্বন পর্যন্ত পৌছতে পারার জন্য আমাদের কর্তব্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেনো আমাদের থেকে কবুল করেন। সালফে সালেহীন ছয় মাস দোয়া করতেন যেনো রমাদ্বন মাস পান আর বাকি ছয় মাস দোয়া করতেন যেনো তা কবূল হয়। আর এমনটি হবেইবা না কেনো? এটি এমন মাস যাতে জান্নাতের দরজা খোলা হয় জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শিকল পড়ানো হয়। আর এতে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২য় অধ্যায়ঃ সিয়ামের হিকমাহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد :

আল্লাহর বান্দাগন! কেনো মুসলিমদের উপর আল্লাহ তাআলা সিয়াম ফরজ করেছেন এই হিকমাহ ব্যাখ্যার্থে অনেক বর্ণনা এসেছে, যা নিম্নরূপঃ

১ম হিকমাহঃ মানুষকে তার অভ্যাস নিয়ন্ত্রন করে, এবং সে হয়ে উঠে কিছু অভ্যাসের সমষ্ঠি। এক পর্যায়ে সে একটি যন্ত্রের রূপ লাভ করে যাকে চালিত করে তার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস সমূহ, এমনকি সে তার গোলাম হয়ে যায়। আর সিয়াম এসেছে তার এই অভ্যাস থেকে দূরে সড়াতে ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে।

২য় হিকমাহঃ সিয়াম অনেক রোগ থেকে আরোগ্য দান করে, যার কারনে চিকিৎসকরা সিয়ামের পরামর্শ দেন। এটি এমন একটি চর্চা যা শরীরকে বিষমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভিন্ন ঔষধ দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি উপকৃত হয়েছে রোজা দ্বারা।

৩য় হিকমাহঃ সিয়াম ধনীকে গরিবের সর্বক্ষন ক্ষুধার্ত থাকার অনুভূতি উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়, যাতে সে নমনীয় ও দয়াপরবশ হয় এবং ধনী গরিবের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।

৪র্থ হিকমাহঃ আল্লাহ তাআলা রোজাকে ফরজ করেছেন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করতে, কষ্ট সহিষ্ণু করে তুলতে এবং নাফসকে নিয়ন্ত্রন ও রুহকে শক্তিশালী করতে। কেননা নাফস সবসময় কষ্ট সহিষ্ণু হতে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ত থেকে মুক্তি পেতে কঠিন প্রশিক্ষনের

মুখাপেক্ষী। কবি বলেনঃ “নাফস হচ্ছে ছোট শিশুর মতো, তুমি যদি ছেড়ে দাও তবে সে মাতৃদুগ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হবে, আর যদি স্তন্য ছাড়াতে চাও তাহলে সে ছেড়ে দেবে”।

হে আল্লাহর বান্দাগন! সিয়ামের অন্তর্নিহিত রহস্য বা হিকমাহ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কেননা ইবাদাতের বাহ্যিক জ্ঞানটাই আমাদের আছে, এর অন্তর্নিহিত প্রকৃত রহস্য জানা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। আর আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তা অবশ্যই ব্যক্তি ও সমষ্ঠির কল্যাণের জন্যই। তাই প্রতিটি মুসলিমের উপর কর্তব্য হচ্ছে ইবাদাত সমূহ করে যাওয়া, চাই সে তার রহস্য জানুক বা না জানুক। সে শুধু বলবে,“শুনলাম এবং মানলাম”।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৩য় অধ্যায়ঃ সিয়ামের হাকিকত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! এই যুগের অনেক মানুষ যেমনটি ভাবে সিয়ামের হাকিকত তেমনটি নয়। তাদের ধারনা সিয়াম হচ্ছে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা। এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি আসলে তেমন নয়। বরং সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর হারামকৃত সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা। যেমন, নিষিদ্ধ জিনিস দেখা, শুনা, পরনিন্দা, গীবত করা ইত্যাদি। সিয়াম একটি অতি মহান এবং উপকারী ইবাদাত। কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি কখনো ভাবতে পারে যে সিয়াম হচ্ছে সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থেকে সারারাত পানাহারে মশগুল থাকা এবং দিনরাত ক্রিড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকা? কোন বুদ্ধিমান লোক কখনো সিয়ামকে এভাবে চিত্রায়িত করতে পারেনা। নাবী (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যাক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ না করবে তার উপোস থাকাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই" (বুখারী)। অর্থ্যাৎ, যে অবান্তর কথা ও কাজ থেকে বিরত না থাকবে তার রোজাতে কোন সওয়াব হবেনা, তাই তার পানাহার বাদ দেওয়ার দরকার নেই। কারন পানাহার করা বৈধ কাজ আর অবান্তর কথা ও কাজ অবৈধ, সে কি হালাল কাজ বাদ দিয়ে হারাম কাজগুলো করবে আর ভাববে যে আমি রোজাদার? হাদিসটিতে রোজা ত্যাগ করতে বলা হয়নি বরং মিথ্যা কথা ও বাতিল কাজ না করতে সতর্ক করা হয়েছে।

হে আল্লাহর বান্দাগন! রোজা একটি অতি মহান আমল, যা প্রবৃত্তিকে দমন করে, ফিতরাতকে পরিষ্কার করে এবং নাফসকে কিতাব ও সুন্নাহর পাবন্দি বানিয়ে দেয়। নাবী (সাঃ) বলেনঃ "তোমাদের কেউ

যদি রোজা রাখে সে যেন স্ত্রী-সহবাস না করে এবং তাড়াহুড়া না করে। তাকে যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে সে যেন বলে আমি রোজাদার” (বুখারী)

রোজাদার এমন এক ইবাদাতে রত থাকে যেখানে উত্তম চরিত্রই মানানসই। আর নাবী (সাঃ) আমাদেরকে রোজার মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের শিক্ষাই দিয়েছেন। কেননা এটাই উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া এবং পরবর্তী দিনগুলোতে তা অভ্যাসে পরিনত করার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৪র্থ অধ্যায়ঃ শয়তানকে শিকলবন্দী করা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! শয়তানকে শিকলবন্দী করা রমাদ্বন মাস আগমন ও এই মাসের সম্মানের একটি আলামত, যাতে করে সে মুমিনদেরকে কষ্ট ও ওয়াসওয়াসা দিতে না পারে। আর এই শিকল পড়ানো বাস্তব এবং আক্ষরিকভাবেই সত্য, জান্নাতের দরজা খোলা ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এর প্রকৃত রুপ ও ধরন আল্লাহ ছাড়া আর কেই জানেনা। হাদিসে এসেছে "রমাদ্বন এলে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়" অন্য বর্ণনায় এসেছে "এবং শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়" (মুসলিম)।

কোন কোন আলেম বলেন, এই শৃঙ্খলিতকরন স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছু কিছু মানুষ ও বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষতো প্রবৃত্তি ও শয়তান দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই আছে। আর নাফসে আম্মারাহ মন্দ প্রবন, তাই সে সবসময় তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হেদায়েত এবং তাওফিকের মুখাপেক্ষী, অন্যথায় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ) এর কথা নকল করে বলেনঃ "নিশ্চই নাফস মন্দ প্রবন তবে আমার রব যাকে চান সে ছাড়া" (ইউসুফঃ ৫৩)। শয়তানের রয়েছে জীন ও মানুষের মধ্যে এক বিরাট বাহিনী, সে তাদেরকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পাঠায় তাদেরকে মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

“তুাম কি দেখোনি আমি শয়তানদেরকে কাফেরদরে উপর লেলিয়ে দিয়েছি, ফলে তারা তাদেরকে চরমভাবে বাতিলের দিকে উৎসাহিত করে” (মারইয়ামঃ ৮৩)। আর শয়তান তার দলকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। সে সব সময় মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে রত আছে, কখনই বিরতি দেয়না, যদি একটু বিরতি দিতো তাহলে আমরা বিশ্রাম নিতে পারতাম!!

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উপর কর্তব্য হচ্ছে মানুষ ও জীন শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে সাবধান থাকা, বিশেষ করে এই রমাদ্বন মাসে, যাতে শয়াতান তার রোজাকে নষ্ট করে না দেয়, এবং তার রোজাটি কেবল উপোস থাকা হিসেবে বিবেচিত না হয়। শয়তান মানুষের কলবের সাথে সব সময় লেগে থাকে। যখনই সে গাফেল হয়ে পড়ে তখনই শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দেয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা শয়তানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ “গোপনে কুমন্ত্রনা দানকারী, যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তরে।” (নাসঃ ৪,৫)

হে আল্লাহর বান্দাগন! শয়তান আদম সন্তানের রক্তের সাথে মিশে থাকে। শুধু মাত্র ইখলাস দিয়েই সে তার থেকে মুক্তি পেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “শুধুমাত্র আমার মুখলিস বান্দাগন ব্যাতিত” (হিজর- ৪০)

সুতরাং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারন তিনিই তার কুমন্ত্রনা থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি বলেনঃ “নিশ্চই শয়তানের চক্রান্ত দূর্বল” (নিসা– ৭৬)। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৫ম অধ্যায়ঃ পরিপূর্ণ সিয়াম

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! নাবী (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যাক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ না করবে তার উপোস থাকাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই" (বুখারী)। পরিপূর্ণ এবং সত্যিকার রোজা ছাড়া আল্লাহর নিকট কেউ মাকবুল সাইম বলে বিবেচিত হবেনা, যেখানে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবৃত্তির অনুসরন থেকে বিরত থাকবে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। আর যে ব্যাক্তি পানাহার থেকে বিরত থেকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয় কিন্তু পরনিন্দা ও গিবত তথা অন্যের দোষ চর্চা, মিথ্যা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকবেনা অথবা হারাম জিনিস দিয়ে রোজা ও ইফতার করবে তার উপোষ থাকা ছাড়া কোন উপকার গবেনা। জাবির (রাঃ) বলেনঃ "তুমি যখন রোজা রাখবে তখন তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাও যেনো রোজা রাখে" অর্থ্যাৎ, মিথ্যা ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ যাকে দুই চুয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস অর্থ্যাৎ জিহ্বা ও দুই রানের মধ্যবর্তী জিনিস অর্থ্যাৎ লজ্জাস্থানের অনিষ্ঠ থেকে বাঁচিয়েছেন সে জান্নাতে যাবে" (তিরমিযী, হাদিসটি হাসান)। এভাবে রোজা রাখলে আল্লাহর নিকট মাকবুল ও পরিপূর্ণ রোজাদার হিসেবে বিবেচিত হওয়া যাবে যাদের প্রতিদানের দায়িত্ত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। নাবী (সাঃ) হাদিসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "আদম সন্তানের প্রত্যেক আমলের জন্যই নির্দিষ্ট আজর (প্রতিদান) রয়েছে শুধু রোজা ছাড়া,

কেননা তা আমার জন্যই রাখা হয় তাই এর প্রতিদান আমিই দেবো” (বুখারী, মুসলিম)।

আল্লাহর বান্দাগন! সিয়াম একটি আমানাত। মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে পরিপূর্ণ রূপে তা আদায় করা ও যে সমস্ত কাজ ও কথা রোজার ক্ষতি করে যেমন মিথ্যা বলা, গিবত করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। কেননা রোজা শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা নয় বরং অন্যায়, অশ্লীলতা, অহেতুক কথাবার্তা, বাচালতা ও গালিগালাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে রোজা। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিকির ও কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে জিহ্বাকে ব্যাস্ত রাখো, তাকওয়া অবলম্বন করো এবং গুনাহ থেকে বেচে থাকো। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ আগেভাগে ইফতারি ও দেরি করে সাহ্‌রী করা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! সাহল বিন সাদ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ "মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত ইফতার তাড়াতাড়ি করবে ততক্ষন তারা কল্যাণের উপর থাকবে" (বুখারী ও মুসলিম)। আবু আতিয়্যাহ (রঃ) বলেন, আমি এবং মাসরুক আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলাম। মাসরুক তাকে বললেন, নাবী (সাঃ)'র সাহাবীদের মধ্যে দুইজন লোক আছেন যারা ভালো কাজে কখনো পিছিয়ে থাকেননা, এদের একজন মাগরিব এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করেন অপরজন দেরি করে করেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন কে তাড়াতাড়ি করেন? মাসরুক বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তখন তিনি বললেন, এটাই নাবী (সাঃ) করতেন (মুসলিম)।

যাইদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, আমরা নাবী (সাঃ) এর সাথে সাহ্‌রী করেছি অতপর নামাজ পরেছি। তাকে বলা হলো এই দুইয়ের মাঝে কতটুকু সময় ছিলো? তিনি বললেন, ৫০ আয়াত পরিমান (বুখারী, মুসলিম)। আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেনঃ "আমাদের ও আহলে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহ্‌রী করা" (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাড়াতাড়ি ইফতার করা সকল উলামাগনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুস্তাহাব, সাহ্‌রী দেরিতে করার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর নাবী (সাঃ) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, এই উম্মতের কল্যান ও বিজয় দ্রুত ইফতার ও তাড়াতাড়ি সাহ্‌রী করার মধ্যেই রয়েছে। কারন ইয়াহুদি নাসারারা

দেরিতে ইফতার করতো এবং সাহ্‌রী করতোইনা। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন মাকরুহ ও হারাম কাজ করা থেকে, এই বিষয়ে কোন কিছু অব্যাক্ত রাখেননি, বরং দিন রাত প্রচার করে আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমানের উপর রেখে গেছেন, রাতকে দিনের মতো করে দিয়ে গেছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যাক্তিরা ছাড়া কেউ এ থেকে পিছলে যাবেনা।

আল্লাহর বান্দাগন! এটি হচ্ছে ইয়াহুদিদের বাড়াবাড়ি ও খৃষ্টানদের ছাড়াছাড়ির মাঝে মধ্যমপন্থী একটি উম্মাত। সুতরাং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে যারা বাঁচতে চায় তাদের কর্তব্য হচ্ছে সুন্নাহর অনুসরন করা। আর নাবী (সাঃ) এর দেখানো পথই সবচেয়ে উত্তম পথ। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৭ম অধ্যায়ঃ রমাদ্বনের কিয়াম

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد :

আল্লাহর বান্দাগন! ক্বিয়ামুল লাইল করা সৎলোকদের স্বভাব, একনিষ্ঠদের প্রতিক ও মুজাহিদদের সম্বল। রমাদ্বন মাসের রাত গুলোতে আমরা দেখি তারাবিহ্ ও তাহাজ্জুদের সলাত জামাআতের সাথে আদায় করে এই মাসের বিশেষ ফজিলত হাসিল করার জন্য মুসলিমগন আল্লাহর ঘরগুলোতে একত্রিত হন। কারন এ মাসে প্রতিটি সৎ আমলের প্রতিদান দ্বিগুন করা হয় এবং মিনতীপূর্ণ দোয়া, কুরআনের আয়াতের গবেষনা ও সলাতে খুশু' খুদু'র মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করা যায়। নাবী (সাঃ) রমাদ্বনের রাতে মাসজিদে ক্বিয়ামুল লাইল করাকে সুন্নাহ করেছেন।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) এক রাতে ঘর থেকে বের হয়ে মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলো। লোকজন এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করায় আরো কিছু লোক মিলিত হলো সলাতে। পরের রাতে আরো লোকজন জড়ো হলো সলাত আদায়ের জন্য। অতপর চতুর্থ রাতে লোকজন আরো বেড়ে গেলো এমনকি মসজিদে জায়গা সংকুলান হচ্ছিলোনা, আর এভাবে চলতে চলতে ফজরের সময় হয়ে গেলো। নাবী (সাঃ) ফজরের সালাত শেষে দাড়িয়ে نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد পাঠ করে বললেন, তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন নয়। কিন্তু আমার আশংকা এটা তোমাদের উপর না ফরজ করে দেওয়া হয় তখন তোমরা তা করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। বিষয়টি এই অবস্থায় রেখে নাবী (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন (বুখারী)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) কিয়ামুল লাইলের বেপারে কঠোর নির্দেশ না দিয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, “যে রমাদ্বনে কিয়াম করবে ইমানের সাথে ও সওয়াবের প্রত্যাশায় তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে” (মুসলিম)

আল্লাহর বান্দাগন! আমাদের উচিৎ কিয়ামুল লাইলকে নিজেদের উপর লাযিম করে নেওয়া, এবং যত সলাত পড়া সম্ভব তা আদায় করা, যাতে রমাদ্বন শেষ হওয়ার আগেই এটা আমাদের অভ্যাসে পরিনত হয় এবং সহজ মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৮ম অধ্যায়ঃ কুরআন ও তার তেলাওয়াতের ফজিলত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “নিশ্চই এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা সুদৃঢ়, এবং সৎ-কর্মপরায়ন মুমিনদেরকে মহান পুরষ্কারের সুসংবাদ” (ইসরাঃ ৯)। ইবনে কাসির এই আয়াত সম্বন্ধে বলেন, “এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা সুদৃঢ়” অর্থ্যাৎ, স্পষ্ট পথ। আর মহান প্রতিদান দেওয়া হবে কিয়ামাতের দিন।

এই কুরআন আল্লাহর শক্ত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় উপদেশ, সরল সঠিক পথ। যে এই কুরআন অনুযায়ী আমল করবে সে প্রতিদান পাবে, এর দ্বারা ফায়সালা করলে ইনসাফ পাবে, এর দিকে আহ্বান করলে সঠিক পথে চালিত হবে।

আলেমগন কখনো কুরআনের বেপারে পরিতৃপ্ত হননা (এর প্রতি তাদের আগ্রহ থেকেই যায়), জিহ্বা কখনো এর দ্বারা বিভ্রান্তিতে পড়েনা, অন্তর কখনো এর দ্বারা বক্র হয়না। যে এই কুরআনকে পরিত্যাগ করে মুমিনদের পথ ছাড়া অন্যপথ গ্রহন করলো আল্লাহ তাকে সেদিকেই ঘুরিয়ে দিবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

কুরআন তেলাওয়াত ও তা শিক্ষা দেওয়ার ফজিলত সম্বন্ধে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নাবী (সাঃ) বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়” (বুখারী)। তিনি আরো বলেনঃ “কুরআন ও সিয়াম কিয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আমার রব আমি একে পানাহার এবং প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার বেপারে আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দিন। কুরআন বলবে , হে আমার রব! আমি

একে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার বেপারে আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দিন। নাবী (সাঃ) বলেন- তখন উভয়কেই শাফায়াত করার সুযোগ দেওয়া হবে" (আহমাদ- এর সনদ সহিহ)

আবু উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেনঃ "তোমরা কুরআন পড়ো কেননা এই কুরআন কিয়ামাতের দিন তার পাঠকের পক্ষে সুপারিশকারী হবে" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন- নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামাতের দিন কুরআনের পাঠক হাফেজকে বলা হবে, তুমি দুনিয়াতে যেভাবে পড়তে সেভাবে পড়তে থাকো আর উপরে উঠতে থাকো, তোমার অবস্থান হচ্ছে শেষ আয়াতটি যেখানে গিয়ে পড়া শেষ করবে সেখানে" (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেনঃ "যে কুরআনের একটি অক্ষর পড়লো তার একটি নেকি, আর প্রতি নেকি দশগুন করা হবে, আমি বলিনা আলিফ-লাম-মিম একটি অক্ষর, বরং আলিফ একটি অক্ষর লাম একটি অক্ষর মিম একটি অক্ষর" (তিরমিযী– তিনি বলেন, হাদিসটি সহিহ)

আল্লাহর বান্দাগন! আমাদের উপর করনীয় হচ্ছে, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র তথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যুদ্ধ ও শান্তিকালীন মুহুর্ত এবং আমাদের চরিত্রে আল্লাহর এই মহান কিতাবের প্রয়োগ ঘটানো। পাশাপাশি এই বরকতময় মাসকে আল্লাহর হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা, তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মানা, মুহকাম আয়াতসমূহ পালন করা ও মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস করার কাজে লাগানো। সর্বোপরি, যথাযথভাবে এর তেলাওয়াত করা। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

৯ম অধ্যায়ঃ তাকওয়ার হাকিকত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! সিয়াম সহ সকল ইবাদাতের মূল উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার চড়ান্ত পর্যায়ে পৌছা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "হে ইমানদারগন! তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো" (সুরা বাকারাঃ ১৮৩)। 'হে ঈমানদারগন' এই বাক্যটি শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারীদের জন্যই খাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ডাকের পর কোন একটি ইসলামী হুকুম বর্ণিত হয়। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখনই শুনবে يا ايها الذين امنوا তখনই তোমার কানকে তিক্ষ্ণ করো, কেননা এরপরই কোন আদেশ অথবা কোন নিষেধের কথা আসবে। তাই তাক্বওয়া হচ্ছে সকল কল্যানের সমষ্টি।

আলেমগন এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, তাকওয়া হচ্ছে সম্মান মিশ্রিত ভয়, নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা, পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা। আরো বলা হয়, তাকওয়া হচ্ছে অবাধ্য না হয়ে আনুগত্য করা, ভুলে না গিয়ে আল্লাহকে স্মরন রাখা, অস্বীকার না করে প্রশংসা করা এবং অকৃতজ্ঞ না হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে তাকওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, উবাই (রাঃ) বললেন, আপনি কি কখনো এমন প্রান্তর দিয়ে যাননি যেখানে প্রচুর কাঁটা রয়েছে? তিনি বললেন হ্যা গিয়েছি। উবাই (রাঃ) বললেন, তখন আপনি কি করেছেন? তিনি বললেন, কাপড়

গুটিয়ে খুব সাবধানে অতিক্রম করেছি যাতে কাঁটা না লাগে। উবাই (রাঃ) বললেন, তাকওয়া এমনই।

সর্বক্ষন তাকওয়া অবলম্বন করলে রিযিক বৃদ্ধি হয়, বিপদ আপদ দুর হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"আর যে আল্লাহকে ভয় করবে তিনি তাকে (কঠিন অবস্থা থেকে) বের হওয়ার রাস্তা করে দিবেন। এবং তাকে এমন দিক থেকে রিজিক দিবেন যা সে চিন্তাও করেনি" (সুরা ত্বলাকঃ ২,৩)

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের একটি পন্থা। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তারাই সফলকাম" (সুরা নুরঃ ৫২)। আর পরহেযগার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

"এই সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী হবে আমার পরহেযগার বান্দারা" (মারইয়ামঃ ৬৩)। জাহান্নাম থেকেও মুত্তাকী ব্যতিত কেউ রেহাই পাবেনা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

“অতপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো” (সুরা মারইয়ামঃ ৭২)। আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার মাধ্যমে তার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং রিযিক বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেনঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের জন্য আসমানী ও পার্থিব নিয়ামাতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম” (সুরা আ’রাফঃ ৯৬)

আল্লাহর বান্দাগন! যে ফেরেশতাদের সুসংবাদ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় সে যেন তাকওয়াকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

“মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কোন হেরফের হয়না। এটাই হলো মহা সফলতা” (সুরা ইউনুসঃ ৬২-৬৪) আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১০ম অধ্যায়ঃ রাইয়ান নামক দরজা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! নাবী (সাঃ) বলেনঃ “জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা রয়েছে যেটা দিয়ে কিয়ামাতের তিন শুধু রোজদারেরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবেনা। অতপর যখন তারা প্রবেশ করে ফেলবে তখন দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবেনা” (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

অপর এক বর্ননায় আছে, “জান্নাতের ৮টি দরজার মধ্যে একটির নাম রাইয়ান, যেটি দিয়ে শুধু রোজাদারেরাই প্রবেশ করবে।”

রোজাদারদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধৈর্য্যধারন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে প্রকাশ্য ও গোপন ইখলাসপূর্ণ রোজার জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটি বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন। আর সেই দরজাটি হচ্ছে রাইয়ান দরজা। আরবি ري থেকে ريان এর উদ্ভব। এটি সেই সব রোজাদারদের জন্য প্রজোয্য যারা পানাহার পরিত্যাগ করেছে এবং মনের সকল কুপ্রবৃত্তিগুলোর ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারন করেছে। এটি রোজাদারদের জন্য ইবাদাতে তাদের ইখলাসের কারনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি সম্মান। এটা সুবিদিত যে আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের প্রতিদানের দায়িত্য নিজে নিয়েছেন, যেমনটি হাদিসে কুদসিতে এসেছে, “রোজা আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেবো”। আর আল্লাহর দেওয়া প্রতিদান অফুরন্ত, মহান ও সীমাহীন।

অন্যদিকে রাইয়ান দিয়ে প্রবেশ করাটা হচ্ছে একটি অতিরিক্ত সম্মান ও প্রতিদান। সলাত আদায়কারীকে সলাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, মুজাহিদকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, সদাকাকারীকে সদাকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে, আর রোজাদারকে ডাকা হবে রাইয়ান দরজা দিয়ে। যার মধ্যে এই সবগুলো গুন থাকবে তাকে সবগুলো দরজা দিয়েই ডাকা হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পরবে, এটি আবু বাকার (রাঃ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমনটি নাবী (সাঃ) বলেছেন।

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়। এই বরকতময় মাসে আল্লাহর আনুগত্যের প্রচেষ্টা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করোনা। আল্লাহ অতি দয়ালু যার অস্তিত্ব খন্ডন করা যায়না। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১১শ অধ্যায়ঃ আল্লাহর দ্বীনে সহজতা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! সহজীকরন ও হালকাকরন আল্লাহর দ্বীনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট। এটা রোজা সহ সকল ইবাদাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই বেপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“রমাদ্বন মাস হলো সে মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য-পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এই মাসটি পাবে সে এই মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্যদিনে গননা পূরন করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, জটিলতা সৃষ্টি করতে চাননা, যাতে গননা পূরন করো এবং তোমাদের হেদায়েত দানের কারনে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো” (সুরা বাকারাঃ ১৮৫)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নাবী (সাঃ) মুআজ বিন জাবাল ও আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, “সুসংবাদ দাও বিচ্ছিন্ন করে দিওনা, সহজ করিও কঠিন করিওনা”। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) একদিন খুৎবা

দেওয়াকালে দেখলেন একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, তিনি লোকটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় লোকেরা বলল, এ হচ্ছে আবু ইসরাইল। সে মানত করেছে সবসময় সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকবে কখনো ছায়ায় যাবেনা, কারো সাথে কথা বলবেনা এবং বিরতিহীন রোজা রাখবে। নাবী (সাঃ) বললেন, তাকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়ায় যায় এবং রোজা পূর্ণ করে" (বুখারী)

নাবী (সাঃ) সবসময় নমনীয়তা ও সহজীকরনের নির্দেশ দিতেন এবং কাঠিন্য থেকে নিষেধ করতেন। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) এর নিকট এক লোক আসলো এবং বললো, অমুক ফজরের সলাত লম্বা করার কারনে আমার দেরি হয়ে যায়। আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ দিন নাবী (সাঃ) যে পরিমান ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন উপদেশ দেওয়ার সময় এমন ক্রোধান্বিত হতে তাকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি বললেন, হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা মানুষকে দুরে সরিয়ে দেয়, তোমাদের মধ্যে যে ইমাম হবে সে যেন সলাত সংক্ষিপ্ত করে, কেননা তার পিছনে বয়স্ক, দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোক থাকতে পারে।

হে আল্লাহর বান্দাগন! গুনাহের কাজ ছাড়া সবসময় নমনীয়তা ও সহজীকরন নাবী (সাঃ) এর দ্বীন ছিলো। আয়েশা (রাঃ) বলেন, "নাবী (সাঃ) কে যখনই দুইটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হতো গুনাহের কাজ না হলে তিনি সবসময় সহজটি গ্রহন করতেন" (বুখারী)। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১২শ অধ্যায়ঃ দুআ ও এর ফজিলত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! নাবী (সাঃ) বলেন, "দুআ-ই হলো ইবাদাত" (আদাবুল মুফরাদ)। সুতরাং দুআ একটি ইবাদাত, কেননা এটি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করার নামান্তর। দুআ হচ্ছে আল্লাহর নিকট যা আছে তা কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করা ও তাঁর প্রতি নমনীয় হয়ে যাওয়া। দুআর অনেক ফজিলত যা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলাই যথেষ্ঠ হবে যে এটি একটি ইবাদাত বরং সম্পূর্ণ ইবাদাত।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর নিকট দুআর চেয়ে অধিক প্রীয় কোন জিনিস নেই" (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে)

আল্লাহর ইচ্ছায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের ক্ষেত্রে দুআ একটি কার্যকরী হাতিয়ার। মুসলিম ব্যাক্তির উচিৎ সচ্ছল, অসচ্ছল উভয় অবস্থায় তার রবের সাথে সম্পর্ক শক্ত রাখা। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া মানে হচ্ছে তাঁর দিকে রুজু হওয়া, অন্তরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা এবং মহানের নিকট ক্ষুদ্র ও অক্ষমের নতি স্বীকার করা।

নাবীগন (আঃ) এই হাতিয়ারটি কঠিন মুহুর্তে ব্যাবহার করেছেন, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন। দুআ অন্তর ও শরীরের সবচেয়ে কার্যকরী ঔষধ, বরং শয়তানের কুমন্ত্রনা ও আদী অসুখ থেকে নাজাত পাওয়ার প্রকৃত মাধ্যম। দুআ কবুলের কিছু শর্ত ও

আদব রয়েছে। যেমন, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া, দুআতে দৃঢ় থাকা, দুআ কবুলের বেপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া, অন্তরকে সপে দেওয়া, গুনাহের স্বীকৃতি দেওয়া, গুনাহ থেকে দুরে থাকা, স্বর নিচু রাখা, শুরুতে হামদ ও নাবীর প্রতি সলাত দিয়ে শুরু করা এবং তা দিয়েই শেষ করা, ইত্যাদি।

হে আল্লাহর বান্দাগন! নাবী (সাঃ) বলেনঃ "তিনজনের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয়না। রোজাদার; যখন সে ইফতার করে, ন্যায়পরায়ন শাসক ও মাজলুম" (আহমাদ, তিরমিযী-সহিহ সনদে)

রমাদ্বনের দিনগুলোতে দুআর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত অর্জন করো যাতে সৌভাগ্যবান হতে পারো যার পরে কোন দুর্ভাগ্য নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৩শ অধ্যায়ঃ হে ইমানদারগন তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"হে ইমানদারগন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যা তোমাদেরকে জীবন্ত করবে। আর জেনে রেখো আল্লাহ ব্যাক্তি ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান করেন। আর তারই নিকট তোমাদেরকে একত্র করবেন" (সুরা আনফালঃ ২৪)।

ইবনুল কায়্যিম (রঃ) এই আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "প্রকৃত জীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমেই অর্জীত হয়। সুতরাং যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া না দেয় তার জীবনই নেই, আর যদিও তার জীবন থেকে থাকে সেটা হচ্ছে পশুর জীবন। প্রকৃত জীবন হচ্ছে সে জীবন যা প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তারাই জীবিত যদিও শারিরিকভাবে তাদের মৃত্যু হয়। আর অন্যরা শারিরীকভাবে জীবিত থাকা সত্তেও প্রকৃত অর্থে তারা মৃত। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী তারাই যারা পূর্ণাঙ্গভাবে রাসুলের ডাকে সাড়া দেয়। কেননা নাবী (সাঃ) যেদিকে আহ্বান করেন তার মধ্যেই জীবন রয়েছে। যে এই আহ্বানের কোন একটি অংশ গ্রহন করতে পারলোনা জীবনের একটি অংশও তার থেকে হারিয়ে গেলো..."

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, “যা তোমাদের জীবন দান করে” অথ্যাৎ, হক পথ ও সঠিক পথ। কাতাদা (রঃ) বলেন, সেটা হচ্ছে কুরআন; যার মধ্যে রয়েছে জীবন, মুক্তি, শক্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের রক্ষাকবচ। আর সুদ্দী (রঃ) বলেন, সেটা হচ্ছে ইসলাম যা তাদেরকে কুফরি করার মাধ্যমে মরে যাওয়ার পর জীবিত করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যাকেই এই আয়াত অন্তর্ভূক্ত করে। ইমান, ইসলাম ও কুরআন অন্তরকে পবিত্র জীবন দান করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বেঁচে থাকার কারন হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগন! এই রমাদ্বন মাস আত্মাকে নিয়ন্ত্রন ও প্রশিক্ষন এবং আল্লাহর কিতাব ও নাবী (সাঃ) এর সুন্নাহর অনুসরনের একটি মহান সুযোগ। সুতরাং তোমরা উহাকে গ্রহন করো যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারো। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৪শ অধ্যায়ঃ রমাদ্বনে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সমূহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! রমাদ্বন মসে ঐতিহাসিক কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যা এই মাসের রুপকে পাল্টে দিয়েছে। হকের পতাকা উচু হয়েছে এবং বাতিলের পতাকা ধ্বংস হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে নিম্নরুপ ঃ

● বদরে কুবরা যুদ্ধ, যাকে আল্লাহ তাআলা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আর এ কথাও জেনে রাখো যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসুলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য-মিথ্যার পর্থক্যের দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়েছিলো উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল" (সুরা আনফালঃ ৪১)। এই যুদ্ধে মুমিনদের ছোট দলটি অহংকারী মুশরিক দলটিকে পরাজিত করেছিলো। আল্লাহর ঘোষনাঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো" (সুরা আলে ইমরানঃ ১২৩)

তিনি আরো বলেনঃ

"অতপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুলো, তখন বললো, নিশ্চই আল্লাহ তোমাদিগকে পরিক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক সেই পানির স্বাদ গ্রহন করলোনা নিশ্চয়ই সে আমার লোক, কিন্তু হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নিলে দোষ নেই। অতপর সবাই পান করলো সে পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিলো মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারনা ছিলো যে আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে তারা বারবার বলতে লাগলো, কত সামান্য দলই তো বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন" (সুরা বাকারাঃ ২৪৯)

● মক্কা বিজয়, যা ৮ম হিজরী সনের রমাদ্বনের ১১ তারিখে সংঘটিত হয়। এই ঘটনার পরই আরব উপদ্বীপে ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিলো। এবং বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধি দল আসতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

“যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য, তখন তুমি দেখবে দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষনা করবে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চই তিনি তওবা কাবুলকারী” (সুরা নাসরঃ ১-৩)

● কাদিসিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে চুড়ান্তভাবে পারস্য শক্তি বা অগ্নীপূজকরা ধ্বংস হয়েছিলো। রুমের কায়সার তখন বলেছিলো, “হে সিরিয়া তোমাকে বিদায়, যে বিদায়ের পর আর সাক্ষাৎ হবেনা।”

● ওয়াদির যুদ্ধের পর তারেক বিন যিয়াদের নেতৃত্তে ৯২ হিজরী সনের রমাদ্বনের ২৮ তারিখ রবিবার মুসলিমগন স্পেন জয় করেন, যা পরবর্তী ৮৯৭ হিজরী সন পর্যন্ত ৮০০ বছর মুসলিমরা শাসন করেছিলো।

● আয়নে জালুত যুদ্ধ, যা সংঘটিত হয়েছিলো মুজাফফর কুতুজের নেতৃত্তে। বাগদাদ ও দামেস্ক ধ্বংস করার পর তাতারীরা যখন মিসরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলো তখন এই যুদ্ধ তাতারীদের ধ্বংসের কারন হয়েছিলো।

আল্লাহর বান্দাগন! আরো অনেক যুদ্ধ রয়েছে যা এই বরকতময় মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৫শ অধ্যায়ঃ এই যুগে মুসলিমদের অবস্থা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! আমাদের গত দিনের সাথে আজকের দিনের কতো পার্থক্য!! আমরা ছিলাম শ্রেষ্ঠ উম্মাহ যাদেরকে মানুষের জন্য উদ্ভব করা হয়েছিলো যখন আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছিলাম। একদিন আমরা নুবুওয়াতি পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা গড়েছিলাম। মানুষ দলেদলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছিলো। ইসলামের ভ্রাতৃত্ত পূর্ব-পশ্চিম, আরব-আজম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মুসলমানেরা সম্মান ও শক্তির অর্থ অনুভব করেছিলো।

রুমের বাদশা নাকফুর যখন তার পূর্বসুরীদের দিয়ে আসা কর আদায় করতে অস্বীকার করে খলিফা হারুনুর রশিদকে চিঠি দিয়েছিলো তখন হারুনুর রশিদ (রঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, “আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে রুমের কুকুর নাকফুরের প্রতি। তোমার চিঠি আমি পড়েছি, উত্তরটা তোমাকে না শুনিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই।” পরবর্তীতে সে আবার জিযিয়া দিতে সম্মতি প্রকাশ করে। তিনি মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, তোমার খেরাজ ঠিকই আমার কাছে এসে পৌছুবে।

আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার কারনে অবস্থা পাল্টে গেছে। আমরা এখন অধপতিত জাতিতে পরিনত হয়েছি। শত্রুরা আমাদেরকে নিয়ে খেলা করে যেমন শিশুরা বল নিয়ে খেলা করে থাকে। আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি বরং দ্বীনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছি। মুসলিমরা তাদের চেতনা থেকে বহু দুরে সরে গেছে। তারা গভীর ঘুমে মগ্ন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমরা আমাদেরকে আহাজারি করে

ডাকছে, কিন্তু কোন সাড়া নেই। আমাদের চোখের সামনে মাসজিদুল আকসা লুণ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা তা দখলদার ইয়াহুদিদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছিনা। সূদ হয়ে গেছে লাভজনক ব্যাবসা, অশ্লীল নৃত্য হয়ে উঠেছে শিল্প, দাড়ি হয়ে গেছে সেকেলে এবং মুনাফিকি সুন্দর কথা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কোথায় গেলো রোজার সুফল? কোথায় যাকাত? হাজ্জে সকল মুসলিমগন একত্র হওয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপকারিতা কোথায় হারিয়ে গেলো?

আমাদের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুনে যারা ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তারা ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত লোক যারা ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের থেকে প্রাপ্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী, আমরা কি তাদের জন্য ফিতনার কারন নই? আমরা তো আমাদের আক্বিদা থেকে পিছু হটে গেছি। আমরা কি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য ফিতনা স্বরূপ নই যারা আমাদের নিকট এসে দ্বীন, দুনিয়া, উন্নতি, অগ্রগতি ও আখলাকের বিন্দু পরিমানও পায়না?

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লহর মহান দ্বীনের দিকে পুনরায় ফিরে এসে আবার শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার কোন সুযোগ কি আমাদের নেই? কুরআনে ঘেষনা হচ্ছেঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা আল্লাহকে সাহায্য করে" (সুরা হাজ্জঃ ৪০)। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৬শ অধ্যায়ঃ রমাদ্বনে আল্লাহর আনুগত্য বাড়িয়ে দেওয়া

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! নাবী (সাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ বলেন, যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষন করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করলাম। বান্দা তার উপর আমি যা ফরজ করেছি তার মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়, আর নফলের মাধ্যমে আরো নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভলোবাসতে শুরু করি। তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে হাটে। সে যদি কোন কিছু চায় আমি তাকে তা দিয়ে দেই। আর আমার কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দেই” (বুখারী)

রমাদ্বনে সব আমলের প্রতিদান দ্বিগুন হওয়ার মাধ্যমে বিশেষায়িত। সুতরাং রোজাদারের উচিৎ এই মাসে বেশি করে ভালো কাজ করা যেমন, জামাআতের সাথে সলাত পড়া, কিয়ামুল লাইল করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, ফরজ যাকাত ও নফল সদাকা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, জিকির আজকার ও ইসতিগফার বাড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে উত্তম উপদেশ ও হিকমাহ’র মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, সম্ভব হলে রমাদ্বনে উমরা করা কেননা এর অনেক ফজিলত, রমাদ্বনের রোজা শেষ করে পুরো বছরের রোজার ফজিলত অর্জনের জন্য শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখা, ইত্যাদি।

নাবী (সাঃ) বলেনঃ “রমাদ্বনের রোজার পর যে ব্যাক্তি শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখবে তার সারা বছরের রোজা রাখার সওয়াব হয়” (বুখারী)

হে আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে রমাদ্বনের দ্বিগুন সওয়াব অর্জন ও আল্লাহর রহমত তালাশ করার তাওফিক আল্লাহ যাকে দান করেন সেই সফলকাম, যার ফলে ইমানের স্বাদ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর বন্ধুত্ত ও ভালোবাসা অর্জিত হবে। আল্লহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৭শ অধ্যায়ঃ রাসূল (সাঃ) এর জীবনযাপন

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

হে আল্লাহর বান্দাগন! ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) ও তার পরিবার লাগাতার কয়েক রাত্রি খাবার পাননি। আর তাদের বেশিরভাগ রুটি ছিলো যবের (তিরমিযী)। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) ও তার পরিবার দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্বে লাগাতার তিনদিন শুকনো রুটিও পেট পুরে খেতে পারেননি (তিরমিযী)

নুমান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, উমার (রাঃ) কে আমি বলতে শুনেছি যে নাবী (সাঃ) কে আমি দেখেছি ক্ষুধার যন্ত্রনায় নাড়িভুড়ি পেছিয়ে থাকতো, তিনি কোন ফলের টুকরোও পেতেননা যা দিয়ে ক্ষুধা নিবারন করা যায় (তিরমিযী)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) এর নিকট একদিন কিছু পাকানো খাদ্য নিয়ে আসা হলে তিনি তা খেলেন তারপর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি এমন পাকানো খাদ্য কতদিন যাবৎ খাইনি (ইবনে মাজাহ)

মাসরুক (রঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলাম, তিনি খাবারের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, আহ কি পরিতৃপ্তির সাথেই না খাচ্ছি!! এটা শুনে আমার প্রচন্ড কাঁদতে ইচ্ছা করলো, শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেললাম। আমি বললাম, এমনটি কেনো বলছেন? তিনি বললেন, আমার স্মরন আছে নাবী (সাঃ) এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান এমন অবস্থায় যখন তিনি দিনে ২বার গোস্ত-রুটি পরিতৃপ্তির সাথে খেতে পারেননি (তিরমিযী)

উমার (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নাবী (সাঃ) এর নিকট গেলাম, গিয়ে দেখি তিনি একটি মাদুরে শুয়ে আছেন। তার পড়নে একটি লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা, আর তার পিঠে মাদুরের দাগ বসে গেছে। ঘরের এক কোনে ১ সা' পরিমান যব আর একটি ঝুলন্ত রং করা চামড়া। নাবী (সাঃ) এর এই করুন অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেলো। নাবী (সাঃ) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেনো কাঁদবোনা? কিসরা ও কায়সার এতো সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপর করে আর আপনি আমাদের নাবী হয়েও একটি মাদুরে শুয়ে আছেন যার দাগ আপনার পিঠে, এবং ঘরে আমি যা দেখছি তা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তাদের জন্য এই দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত? আমি বললাম, জি অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর বান্দাগন! এমনই ছিলো তোমাদের নাবীর জীবন। এই অবস্থা কি তাঁর সম্মান ও মার্যাদাকে কমিয়ে দিয়েছে? নাবী (সাঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি সুস্থ পরিবার এবং সুস্থ শরীরে নিরাপদে ও একদিনের খাদ্যের যোগান সহ সকালে উপনিত হয়েছে সে যেনো দুনিয়ার সবকিছুই পেয়ে গেলো" (ইবনে মাজাহ)। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৮শ অধ্যায়ঃ রমাদ্বনে উমরাহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! উমরাহ'র রয়েছে অতিউচ্চ মরতবা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। নাবী (সাঃ) বলেন, "রমাদ্বনে একটি উমরাহ হাজ্জের সমান" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আমার সাথে হাজ্জের সমান" (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা হাজ্জ এবং উমরাহ একটার পরপর আরেকটি করো, কেননা এই দুইটি দারিদ্র ও গুনাহকে এমনভাবে দুরে সরিয়ে দেয় যেমন হাপরের আগুন লোহা ও সোনা-রুপা থেকে খাদ বের করে দেয়। আর কবুল হাজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই না" (তিরমিযী, তিনি বলেন হদিসটি হাসান সহিহ)

আল্লাহ তাআলা উমরাহ'র মাধ্যমে এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ'র মধ্যবর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেন। নাবী (সাঃ) বলেন, "কবুল হাজ্জের সওয়াব হচ্ছে জান্নাত" (বুখারী ও মুসলিম)। সাধারন সময়ে উমরাহ'র সওয়াব এবং মর্যাদা এমন আর রমাদ্বনে তা হাজ্জের সমান। এর মানে এই নয় যে, রমাদ্বনে উমরাহ করলে হাজ্জের ফরজিয়্যাত শেষ হয়ে যায়, বরং এই বেপারে ইজমা আছে যে, এতে হাজ্জের ফরজিয়্যাত শেষ হয়না।

আল্লাহর বান্দাগন! রমাদ্বনে উমরাহ'র সওয়াব হাজ্জের সমান হওয়াটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সৎলোকদের জন্য একটি বিশেষ

নিয়ামাত, দয়া ও ইহসান। কেননা ইবাদাতের মর্যাদা সময়ের মর্যাদার সাথেসাথে বাড়ে, যেমন সওয়াব বাড়ে ইখলাস ও সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং ঐ পবিত্র ভূমিতে গিয়ে উমরাহ করার সুযোগ যার হয় তার উচিৎ তা আদায় করে আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ সওয়াব অর্জন করা। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

১৯শ অধ্যায়ঃ ইসলামে ওয়ালা ও বারাআ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগন! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ত করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা" (সুরা মাইদাহঃ ৫১

ওয়ালা ও বারাআ একটি শার'ঈ ওয়াজিব, বরং এটি শাহাদাহ'র একটি গুরুত্তপূর্ণ শর্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শেষ যামানায় মুসলিমরা এই নীতির অনেক ব্যাত্যয় ঘটিয়েছে। তারা সালাফদের অনুসৃত পথ তথা, জিহাদ, ভালোমন্দের বাছবিচার, সম্মান, নেতৃত্ত ও আলেমদের অনুসরন করা থেকে দুরে সরে গেছে। বর্তমান বিশ্বে এমন কিছু অদ্ভূত ও বিকৃত দাওয়াতি কাফেলা প্রকাশ পেয়েছে যারা ভ্রাতৃত্তের সমতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির কথা বলে। আর এই মতবাদ গুলো বিভিন্ন নাম ও ইশতেহার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন, বিশ্বায়ন, মানবতা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক সংহতি ইত্যাদি।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এই মতবাদগুলোতে অনেক মুসলিমরা সম্পৃক্ত হয়েছে। যার কারনে ওয়ালা ও বারাআহ'র নীতিমালা

তাদের থেকে উঠে গেছে এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ত জুড়ে গেছে। যেমন,

- সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও মনের খুশির জন্য তাদের দেশে ভ্রমন করা।
- কথা ও পোষাক-পরিচ্ছদে তাদের সাদৃশ্য ধারন করা।
- তাদের নামে নাম রাখা।
- তাদের দেশে অবস্থান করা ও দ্বীন নিয়ে মুসলিমদের দেশে পালিয়ে না আসা।
- তাদের তারিখ অনুযায়ী তারিখ গননা করা, বিশেষত উৎসবের দিনগুলো।

এমন আরো অনেক বিষয় আছে যা ওয়ালা ও বারাআর সাথে সাংঘর্ষিক।

আল্লাহর বান্দাগন! এই বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান থাকা জরুরি হয়ে পড়েছে, পাশাপাশি এর বিপরিত জ্ঞানগুলোও অর্জন করতে হবে যাতে করে শত্রুদের বিরুদ্ধে দাড়ানো যায় এবং বিকৃত মতবাদগুলোর সাথে সম্পৃক্ত না হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২০শ অধ্যায়ঃ রমাদ্বনের শেষ দশকের ফজিলত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে আয়েশা (রাঃ) বলেন, "যখন রমাদ্বনের শেষ দশক আসতো তখন নাবী (সাঃ) শক্তভাবে কোমর বেধে ইবাদাতে লেগে যেতেন। এবং তিনি নিজে রাত জাগতেন ও পরিবারকেও জাগাতেন"। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, "যখন শেষ দশক আসতো তখন তিনি এমন মুজাহাদা করতেন যা তিনি অন্য সময় করতেননা"। এই হাদিসগুলোতে শেষ দশকের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং বেশিবেশি কিয়াম করতে পরিবারকে জাগিয়ে দিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা এই ফজিলত গ্রহন করো ও তা হেলায় নষ্ট করোনা। কেননা যে ব্যাক্তি এই সময় আমল করার তাওফিক পেলো সে অনেক কল্যান ও শান্তি পেলো। তাই তোমরা আল্লাহকে নিজেদের ভালো কাজগুলো করে দেখাও।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো; রমাদ্বনের শেষ দশক উত্তম নাকি জিলহাজ্জের প্রথম দশক উত্তম? তিনি বললেন, জিলহাজ্জের দশকের দিনগুলো রমাদ্বনের দিনগুলোর চেয়ে উত্তম, আর রমাদ্বনের দশকের রাতগুলো জিলহাজ্জের দশকের রাতগুলো থেকে উত্তম।

ইবনুল কায়্যিম (রঃ) বলেন, জ্ঞানী ব্যাক্তির জন্য এই উত্তরটাই যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট জিলহাজ্জের দশকের দিনগুলোর চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এর মধ্যে রয়েছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, তালবিয়্যাহ'র দিন। অন্যদিকে রমাদ্বনের শেষ

দশকের রাতগুলোর চেয়ে উত্তম কোন রাত নেই, এই রাত্রিগুলোতে নাবী (সাঃ) পুরো রাত জাগতেন, এর মধ্যে রয়েছে ক্বদরের রাত্রি যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২১শ অধ্যায়ঃ ই'তিকাফ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগর! আয়েশা (রাঃ) বলেন, "নাবী (সাঃ) ইন্তিকালের আগপর্যন্ত রমাদ্বনের শেষ দশকেই ই'তিকাফ করেছেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগন করেছেন" (বুখারী)। সাহাবীগন ও তাদের পরে তাবীঈগনও তাই করেছেন। আর ই'তিকাফের মহান ফজিলত অর্জনের জন্য আল্লাহর ঘরগুলোতে ই'তিকাফ চলতেই থাকবে।

ইবনুল কায়্যিম (রঃ) ই'তিকাফের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহ তাআলা ই'তিকাফ ফরজ করেছেন যাতে অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুকে পড়ে এবং এককভাবে সৃষ্টিকর্তার জন্যই নিবেদিত হয়। এক পর্যায়ে আল্লাহর জিকির তার ভালোবাসা ও আল্লাহর অভিমুখী হওয়াটা তার অভ্যাসে পরিনত হয়। এমনকি অন্তরের উপর নিজের প্রভাব পরিপূর্ণভাবেই বিস্তার করতে পারে। আর এমনটি হলেই কলবের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর স্মরনে মাশগুল থাকবে, যে কাজগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং তার নৈকট্য পাওয়া যায় সেগুলো করতে আগ্রহী হবে। সর্বোপরি সে সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহন করবে এবং এর মাধ্যমে কবরের নিঃসঙ্গতার দিনগুলোতে তাঁর সঙ্গ পাওয়ার আশা করবে, যখন তার সঙ্গী ও দুঃশ্চিন্তা দুর করারও তিনি ছাড়া কেউ থাকবেনা। আর এটাই হচ্ছে মহান ই'তিকাফের উদ্দেশ্য"

আল্লাহর বান্দাগন! ই'তিকাফ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য মসজিদে সর্বক্ষন অবস্থান করা। এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে;

১. নিয়্যাত। নাবী (সাঃ) বলেন; "সকল কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল" (বুখারী)

২. মসজিদে হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"আর যতক্ষন তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো ততক্ষন পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশোনা।" (বাকারাঃ ১৮৭)

৩. মসজিদটি এমন হতে হবে যাতে জামাআতে সলাত আদায় করা হয়। আয়েশা (রাঃ) হতে সহিহ সনদে বর্ণিত বাইহাকীর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, ...আর জামাআতের মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২২শ অধ্যায়ঃ কদরের রাত্রি

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা রমাদ্বনকে একটি বিশেষ রাত দ্বারা বিশেষায়ীত করেছেন, যে রাতের শানে তিনি গোটা একটি সুরা নাযিল করেছেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ -تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍسَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"আমি এই কিতাব নাযিল করেছি কদরের রাত্রিতে। কদরের রাত্রি সম্বন্ধে কি আপনি জানেন? কদরের রাত হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগন ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা শান্তি ও নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে" (সুরা ক্বদরঃ ১-৫)। এই রাত মহামহিমান্বিত এক রাত। অনেক কারনে এই রাত বিশেষায়িত, তার মধ্যে;

ক. কুরআন নাযিল। এই রাতেই ওহী আকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে। এটিই এই রাতের সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

খ. এই রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম (সুরা কদরঃ ৩)

গ. এই রাতের কিয়াম বিগত জীবনের গুনাহ মাফের কারন হয়। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণীত হাদিসে নাবী (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রিতে কিয়াম

করবে তার বিগত জীবনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

ঘ. এই রাতে জিবরীল (আঃ) ও অন্যান্য ফেরেশতাগন আল্লাহর অনুমতিক্রমে অবতরন করেন। (সুরা কদরঃ ৪)

ঙ. ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এই রাত শান্তিময়। আয়াতে سلام হচ্ছে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের উপর ফেরেশতাদের সালাম। আরো বলা হয়, মুমিনদের উপর শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপত্তা মিলে এই রাতে। আরো বলা হয়, এই রাতের সবটাই কল্যাণকর, এর মধ্যে কোন অকল্যাণ নেই। আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে।

হে আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহর তোমাদের রহম করুন। তোমরা কদরের রাত্রি খোজার জন্য মুজাহাদা (চুড়ান্ত প্রচেষ্টা) করো, এবং বেশি করে এই দোয়া করো, “হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন”। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নাবী (সাঃ) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি কদরের রাত্রি পাই তাহলে কি পড়বো? তিনি বললেন, তুমি বলবে, “হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন” (আহমাদ, তিরমিযী, তিনি সহিহ বলেছেন)। আল্লাহ ভালো জনেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৩শ অধ্যায়ঃ আখেরাতে সফলতার জন্য দুনিয়াকে কাজে লাগানো

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাকো হে বুদ্ধিমানগন" (সুরা বাকারাঃ ১৯৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি অপরিচিত বা পথিক"। ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, "যখন তুমি বিকালে উপনিত হবে তখন সকালের অপেক্ষা করোনা, আর যখন সকালে উপনিত হও তখন বিকালের অপেক্ষা করোনা। সুস্থ থাকাবস্থায় অসুস্থতার প্রস্তুতি গ্রহন করো এবং জীবিত থাকাবস্থায় মৃত্যুর পাথেয় সংগ্রহ করো" (বুখারী)

মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহ যতোদিন চান ততদিন অবস্থান করবে, তারপর একদিন তার মৃত্যু হবেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"নিশ্চই তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে" (সুরা যুমারঃ ৩০)। আর মানুষ জানেনা তার মেয়াদ কখন শেষ হবে এবং তার মৃত্যু হবে। ঘোষনা হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"নিশ্চই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং গর্ভশিয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যুবরন করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত" (সুরা লুকমানঃ ৩৪)।

মানুষের বয়স যতই বাড়ুক দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে আর এটি চুড়ান্ত সত্য। আমরা প্রতিদিন এই দুনিয়া দেখি, প্রতিমুহুর্তে অনুভব করি, তারপর এমন এক চিরস্থায়ী জীবন আসবে যার কোন শেষ নেই। ঐ জীবনই হচ্ছে আখিরাতের জীবন, যেটা আসবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাদের কবর থেকে আমলের হিসাব নেওয়ার জন্য পুনরোত্থিত করে একত্র করার পর। তখনই ফায়সালা হবে সে কি জান্নাতে যাবে যার প্রশস্ততা আকাশ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, নাকি জাহান্নামে যাবে যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফেরেদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে, সেখান থেকে কখনো বের হবেনা।

তাই বিবেকসম্পন্ন মুমিন কখনো এই দুনিয়ার ধোকায় পড়বেনা, দুনিয়া পেয়েই স্থীর হয়ে যাবেনা এবং এই দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করবেনা। বরং তার আশা-আকাঙ্খাকে খাটো করে আনবে এবং এই দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র হিসাবে গ্রহন করবে যার ফসল

আখিরাতে তার মুক্তির ওয়াসিলা হবে এবং জাহান্নামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবলম্বন হিসাবে গ্রহন করবে। আল্লাহ তাআলা এক মুমিন বান্দার কথা নকল করে বলেনঃ

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

"হে আমার কওম! পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ" (সুরা গাফিরঃ ৩৯)

আল্লাহর বান্দাগন! আমাদের উচিৎ, এই বরকতময় মাসে আনুগত্য ও ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা, যাতে দুনিয়ার ভালোবাসা ও এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া থেকে নাফসকে পবিত্র রাখতে পারি। কেননা মানুষ জনেনা তার নির্দিষ্ট সময় কখন শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৪শ অধ্যায়ঃ পরিক্ষা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে প্রতিনিধি করে পঠিয়েছেন, আর জীবন মৃত্যু দিয়েছেন তাকে পরিক্ষা করার জন্য। তিনি বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরিক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে" (সুরা আম্বিয়াঃ ৩৫)

নাবী (সাঃ) বলেনঃ "বড় পুরষ্কার বড় পরিক্ষার সাথেই রয়েছে। আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরিক্ষা/বিপদে ফেলেন, এই পরিক্ষায় পড়ে যে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহর সন্তোষ, আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তোষ" (তিরমিযী, তিনি বলেন হদিসটি হাসান)

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বলেন; আমি যখন বান্দাকে দুটি (দুই চোখ) প্রিয় জিনিসের ক্ষেত্রে পরিক্ষায় ফেলি তখন সে যদি ধৈর্য্যধারন করে আমি তাকে ঐ দুটির বিনিময়ে জান্নাত দিবো" (বুখারী)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, "মুমিন নারী পুরুষ হামেশাই তার জানমাল ও সন্তান সন্তুতির ক্ষেত্রে পরিক্ষায় আপতিত হতেই থাকে। এভাবে চলতে চলতে সে যখন আল্লাহর সাথে

সাক্ষাৎ করে তখন তার কোন গুনাহই থাকেনা” (তিরমিযী, তিনি বলেন হাদিসটি সহিহ)

দুনিয়া হচ্ছে মুমিনের কারাগার, এখানে সে যেকোন বিপদে পড়লে যদি ধৈর্য্যধারন করে এবং পুণ্যের আশা করে কিয়ামতের দিন এজন্য তার প্রতিদান সে পাবে।

হে আল্লাহর বান্দাগন! তোমরা জানলে যে দুনিয়া হচ্ছে একটি ধোকা ও পরিক্ষার স্থান। তাই যখন অপছন্দনীয় কোন কিছুর সম্মুখীন হবে তখন ধৈর্য্যধারন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যানকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্য অকল্যানকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানোনা” (সুরা বাকারাঃ ২১৬)

আর এই পরিক্ষার মোকাবেলায় তিনি এমন এক হাতিয়ার দিয়েছেন যার তুলনা হয়না, আর তা হচ্ছে সবর। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৫শ অধ্যায়ঃ তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমাদের হাতের কামাই

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! এটা গোপন নয় যে সমস্ত বিপদাপদ ও ফিৎনা যেমন, যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, ক্ষরা, এবং ধ্বংসাত্মক ঘটনাসমূহ যা জানমালের অনেক ক্ষতি করে এই সবই আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয় তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন" (সুরা শুরাঃ ৩০)

তিনি আরো বলেনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে" (সুরা রুমঃ ৪১)

এই দুটি আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন ব্যাক্তি বা জামাআত যখন আল্লাহর দ্বীন ও হুকুম আহকাম থেকে দুরে সরে যায় তখন তারা বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়। অত্যধিক অন্যায় অবিচার আল্লাহর ক্রোধের কারন হয়ে থাকে। কুরআনে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক রাসুলদেরকে অমান্য করার কারনে শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নুহ (আঃ) এর জাতি তুফান দ্বারা, সালিহ ও শুয়াইব (আঃ) এর জাতি কঠিন ভূমিকম্প, আদ জাতি তীব্র ঝঢ়, লুত (আঃ) এর জাতি

পাথর বৃষ্টি ও ফেরাউনের জাতি পানিতে ডুবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত ঘটনাগুলো কোন কাকতালীয় বেপার ছিলোনা, বরং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। এভাবে অনেক জাতিকে অহংকার ও অবাধ্যতার কারনে ধ্বংস করে দিয়ে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয় করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

"অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রাসূলগনের আদেশ অমান্য করেছিলো, তাই আমি তাদের কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো এবং তাদের কর্মের পরিনাম ক্ষতিই ছিলো" (সুরা তালাকঃ ৮,৯)

আল্লাহর বান্দাগন! আমরা কি প্রকৃতভাবে আল্লাহর কিতাব ও নাবীর সুন্নাহ'র দিকে ফিরে আসতে পারিনা? যাতে আমাদের উপর আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে পারি। রমাদ্বন মাসে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। সুতরাং, তোমরা বেশি করে দুআর মাধ্যমে এই সুযোগ কাজে লাগাও। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদের উপর আপতিত বালা মুসিবাত ও বিপর্যয় সমূহ উঠিয়ে নিবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আল্লাহই ভালো জনেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৬শ অধ্যায়ঃ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষন

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ - فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ - خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ - وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

"যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে তবে তোমার প্রতপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়" (সুরা হুদঃ ১০৫-১০৮)

ইবনুল কায়্যিম (রঃ) বলেন, "সৌভাগ্য ও সফলতার আলামত হচ্ছে যখন কারো জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তখন তার দয়া ও নমনীয়তা বেড়ে যায়। আর যখন আমল বৃদ্ধি পায় তখন তার সতর্কতা ও ভীতি বেড়ে

যায়। এবং যখন তার শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায় তখন মানুষের প্রতি নমনীয়তা ও কাছাকাছি গিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরন করার ইচ্ছা বেড়ে যায়। অন্যদিকে দুর্ভাগ্যের লক্ষন হচ্ছে, যখন তার ইলম বৃদ্ধি পায় তখন তার অহংকার বেড়ে যায়, আমল বাড়লে গর্ব ও মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য বৃদ্ধি পায় এবং নিজের প্রতি সুধারনা বেড়ে যায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে লোভলালসা বেড়ে যায়, আর সম্পদ বাড়লে কৃপনতা বেড়ে যায়, এবং শক্তি-ক্ষমতা বাড়লে অহংকার বৃদ্ধি পায়”

আর এ সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিক্ষা যা দ্বারা তিনি বান্দাকে পরিক্ষা করেন। অতঃপর কেউ এই পরিক্ষা দ্বারা সৌভাগ্যের অধিকারী হয় এবং কেউ দুর্ভাগা হয়।

তেমনিভাবে কারামতও একটি পরিক্ষা। যেমন, ক্ষমতা, সম্পদ, রাজত্ত। নাবী সুলাইমান (আঃ) যখন বিলকিসের সিংহাসন তার সামনে দেখতে পেলেন তখন তার উক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

“কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো সে বলল, আপনার দিকে আপনার দৃষ্টি ফেরাবার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো। অতঃপর সুলাইমান যখন তার সামনে রক্ষিত দেখলেন তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরিক্ষা করেন যে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়

সে জেনে রাখুক যে, আমার রব অভাবমুক্ত কৃপাশীল” (সুরা নামলঃ ৪০)

তিনি আরো বলেনঃ

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ - وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ -كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

“মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরিক্ষা করতঃ সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। আর যখন তাকে পরিক্ষা করতঃ তার রিজিক সংকুচিত করে দেন তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। এটা অমূলক, বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করোনা” (সুরা ফাজরঃ ১৫-১৭)

অর্থ্যাৎ, যাকেই দুনিয়ার সম্মান ও নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে সেটা সম্মান ও দয়াবশত দেওয়া হয়েছে এমনটি নয়, আর যার রিজিক সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে তাকে লাঞ্চিত করা হয়েছে এমনটিও নয় বরং উভয়টিই পরিক্ষা। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৭শ অধ্যায়ঃ নির্দিষ্ট দিন সমূহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

"হে ঈমানদারগন! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেনো তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো। সুনির্দিষ্ট কিছু দিন সমূহ" (সুরা বাকারাঃ ১৮৩-১৮৪)। "সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ" বলতে বুঝায়, আসন্ন আগমন এবং দ্রুত প্রস্থান। আর এটি হচ্ছে বাস্তবতা, তাই আমরা এই মাসটিকে স্বাগত জানাবো যাতে তাকে বিদায় দিতে পারি। সুতরাং এই মাসকে গুরুত্ত দেওয়ার বেপারে সতর্ক হও। আর এটা পরিপূর্নতা লাভ করবেনা যতক্ষননা আমরা সময়মতো সলাত, সিয়াম, কিয়াম ও কুরআন তেলাওয়াত করি।

তুমি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনই কেবল এই পৃথিবীতে অবস্থান করবে। তোমার বয়স তোমাকে চুড়ান্ত মেয়াদের দিকে নিয়ে যাবে। বলা হয়- ঐ ব্যাক্তি কিভাবে দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত হতে পারে যার দিনগুলো মাসগুলোকে খেয়ে ফেলছে, মাসগুলো বছরগুলোকে, আর বছরগুলো তার বয়সকে শেষ করে দিচ্ছে এবং তার বয়স নির্দিষ্ট মেয়াদের দিকে, আর তার জীবন মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে!! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক আর আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতিসত্বর তারা জেনে যাবে" (সুরা হিজরঃ ৩)।

আল্লাহর বাণী أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ এই দুনিয়াতে তোমার অবস্থানের মেয়াদকে স্মরন করিয়ে দেয়। আর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এখান থেকে অন্য এক জগতে প্রস্থান করছো তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আজকে শুধু কাজ করছো হিসাব নেই, আর আগামীকাল শুধু হিসাব হবে কাজ করার সুযোগ থাকবেনা।

আল্লাহর বান্দাগন! আমরা কখন আমাদের অচেতন অবস্থা থেকে চেতনায় ফিরবো? দিনগুলো কিন্তু ঠিকই অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে, জীবনের পৃষ্ঠাগুলো ভাজ হয়ে যাচ্ছে, আর আমলগুলো আল্লাহর নিকট উঠে যাচ্ছে, অথচ মানুষ অচেতনতায় মগ্ন হয়ে আছে। করে যাও, তোমার এই কয়েকদিনে তুমি যা খুশি করে যাও! "পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের স্থান" (সুরা গাফিরঃ ৩৯)

আবুদ্দারদা (রাঃ) একদিন দামেশকের মাসজিদের দরজায় দাড়িয়ে বললেন, "হে দামেশকবাসী! তোমরা কি তোমাদের এক কল্যানকামী ভাইয়ের কথা শুনবে? তেমাদের পূর্বে যারা ছিলো তারা বেশি করে জমা করতো, শক্ত মজবুত প্রাসাদ নির্মান করতো ও দীর্ঘ আশা করতো। তাদের সে জমানো সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, প্রাসাদ সমূহ কবরে পরিনত হয়েছে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ধোকায় পরিনত হয়েছে"। তিনি আরো বলতেন, "তিনটি বিষয় আমাকে হাসাতে হাসাতে কাঁদিয়ে ফেলে; দুনিয়াকামী ব্যাক্তি যাকে মৃত্যু তালাশ করছে, ভরা মুখে হাস্যরসকারী ব্যাক্তি যে জনেনা সে তার রবকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে নাকি অসন্তুষ্ট করেছে এবং উদাসীন ব্যাক্তি যার বেপারে আল্লাহ তাআলা উদাসীন নন"। আল্লাহই ভালো জনেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৮শ অধ্যায়ঃ ফিতরের যাকাত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! তোমাদের প্রতিপালক এই মাসের শেষে ফিতরের যাকাতের শার'ঈ বিধান দিয়েছেন। খাবারের মধ্য থেকে এক সা' পরিমান প্রদান করাকে নাবী (সাঃ) ফরজ করেছেন। বুখারী (রঃ) বর্ণিত হাদিসে ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, "নাবী (সাঃ) খেজুর কিংবা যবের এক সা' পরিমান ফিতরের যাকাত ফরজ করেছেন মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট, বড়, দাস, স্বাধীন সকলের উপর। এবং তা মানুষজন ঈদের সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন"।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "নাবী (সাঃ) ফিতরের যাকাতকে ফরজ করেছেন রোজাদারের ভূলভ্রান্তি ও অহেতুক কর্মকান্ডের কাফফারা ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যারা সলাতের পূর্বেই তা আদায় করবে তা ফিতরের যাকাত হিসাবে কবুল হবে, আর সলাতের পরে দিলে তা সাধারন সদাকা হিসাবে গন্য হবে" (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, আলবানী একে সহিহ বলেছেন)।

সুতরাং এর সময় হচ্ছে ঈদের রাত্রে সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে ঈদের সলাত পর্যন্ত। ঈদের দুয়েকদিন আগে আদায় করাও জায়েয আছে। এর পরিমান নাবী (সাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত এক সা', আর তা বর্তমান হিসাবানুযায়ী ২ কেজি ৪০ গ্রামের কাছাকাছি।

ফিতরের যাকাতে মানুষের খাদ্য দিতে হবে। যেমন; খেজুর,গম, যব, চাল যেগুলো মানুষ সাধারনত আহার করে থাকে। এই খাদ্যের

মূল্য দিয়ে দিলে হবেনা। কেননা তা নাবী (সাঃ) এর নির্দেশের পরিপন্থী। এটি একটি নির্দিষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে ফরজ ইবাদাত, ঐ নির্দিষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তার ফরজিয়্যত আদায় হবেনা। আর এই যাকাতের প্রাপক হচ্ছে অভাবগ্রস্থ এবং ঋনগ্রস্থরা যারা ঋন আদায়ে সক্ষম নয়। তাদের প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হবে। একজন অভাবগ্রস্থকে দুই ফিতরা বা তার বেশি দেওয়া যেমন জায়েয আছে তেমনি একটি ফিতরাও একাধিক দরিদ্রের মাঝে বন্টনের বিধানও আছে। আবার পরিবারের সকলের ফিতরা পরিমানমত মেপে একত্র করার পর সেখান থেকে না মেপে বন্টন করাও জায়েয।

আল্লাহর বান্দাগন! তোমরা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে নাবী (সাঃ) এর নির্দেশ মান্য করার্থে সদাকাতুল ফিতর আদায় করো। এবং দেওয়ার সময় সতস্ফুর্তভাবে ভালোটা দিবে। আল্লাহ আমাদের সৎ আমলগুলো কবুল করুন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

২৯শ অধ্যায়ঃ রমাদ্বনকে বিদায় জানানো

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহকে ভয় করো ও তোমাদের এই মাসকে ভালোভাবে বিদায় জানাও এবং আল্লাহর নিয়ামাত সমূহকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহন করো, আর নাফসকে কুপ্রবৃত্তি ও সীমালংঘন থেকে বিরত রাখো এবং বিগত দিনগুলোতে যা হারিয়েছো তা অর্জন করো, কেননা তোমাদের এই মাসটি শেষ হতে চললো, আগামীদিন এই মাসটিই তোমাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে স্বাক্ষী হবে। সুতরাং তাওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটাও। আর আল্লাহর কাছে রোজা ও কিয়ামে হয়ে যাওয়া ভুলভ্রান্তিগুলোর জন্য নিষ্কৃতি প্রর্থনা করো।

একদিন ফাদিল এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কতো? লোকটি বললো ৬০ বছর। ফদিল বললেন, তুমি ৬০ বছর যাবৎ তোমার রবের দিকে যাচ্ছো, হয়তো শীঘ্রই পৌছে যাবে। লোকটি বললো, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন (নিশ্চই আমরা আল্লহর জন্য আর তাঁর নিকটেই ফিরে যাবো)। তিনি বললেন, এর ব্যাখ্যা জানো? এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে জানবে যে সে একজন গোলাম/দাস এবং তাকে ফিরে যেতে হবে তার এটাও জেনে রাখা উচিৎ যে তাকে রবের সামনে দাঁড়াতেও হবে। আর যে জানে যে সে দাঁড়াবে সে জেনে রাখুক তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। আর যে জানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে যেনো উত্তর প্রস্তুত রাখে। তখন লোকটি বললো, তাহলে উপায় কি? ফাদিল বললেন, সহজ, তোমার বাকি জীবন ভালো কাজ করো গত জীবনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আর যদি বাকি জীবন মন্দ

কাজ করো তাহলে পিছনের জীবন ও সামনের বাকি জীবনের গুনাহর বোঝা তোমার উপর চাপবে।

হে আল্লাহর বান্দাগন! তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত গ্রহন করা ও এই মাসটি শেষ করতে পারার জন্য শুকরিয়া আদায় করা, কারন তোমরা জানোনা আগামী বছর এই মাসটি পাবে কিনা। হে আল্লাহ আপনার আগাম জ্ঞানে যদি থাকে যে আমরা আবার এই মাসটি পাবো তাহলে তাতে বারাকাহ দিন। আর যদি আমাদের মেয়াদ শেষের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বাকিদেরকে এর উত্তম প্রতিনিধি বানান। যারা গত হয়ে গেছে তাদের উপর আপনার রহমত প্রসারিত করে দিন। আমাদের সকলকে আপনার রহমত ও ক্ষমা নসিব করুন। হে আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাকে এবং জীবিত-মৃত সকল মুসলিমকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا

অধ্যায় ৩০ঃ তাকবীর ও ঈদের সলাত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، وبعد:

আল্লাহর বান্দাগন! মাস পুরা করার সময় তাকবীর দিতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"যাতে তোমরা গননা পূরন করো এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরূন আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারো" (সুরা বাকারাঃ ১৮৫)। সুতরাং; ঈদের রাত্রে সূর্য ডোবা থেকে ঈদের সলাত পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকো মাসজিদ, বাজার ও বাড়িতে

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر و لله الحمد

আল্লাহর সম্মান ও ইসলামের শাআইরকে প্রকাশ করার্থে তোমরা এই তাকবীর উচ্চ আওয়াজে পড়তে থাকবে। তবে মহিলারা আস্তে আস্তে পড়বে।

আর সলাতুল ঈদ! নাবী (সাঃ) নারী, পুরুষ, ক্রীতদাস ও অসুস্থ মহিলারা যাদের বাহিরে যাওয়ার অভ্যাস নেই তাদেরকেও এই সলাতের নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি ঋতুবতী নারীদেরকেও বলেছেন ঈদগাহে যেতে, যাতে তারা মুসলিমদের দাওয়াত ও দোয়া দেখতে পারে। তবে তারা নামাজের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, "নাবী (সাঃ) আমাদেরকে ফিতর ও আযহার ঈদে বের হতে নির্দেশ

দিয়েছেন - ঋতুবতী, ক্রীতদাস এবং অচল মহিলাদেরকেও, তবে ঋতুবতীরা নামাজ থেকে দুরে থাকবে, আরেক বর্ণনায় এসেছে; নামাজের স্থান থেকে, এবং মুসলিমদের দাওয়াত দেখবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কারো কারো উড়না নেই। তিনি বললেন, অন্য কেউ তাকে উড়না দিবে"। সলাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় তথা ৩টি বা ৫টি খেজুর খেয়ে বের হওয়া সুন্নাহ, যে রাস্তা দিয়ে যাবে অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরাও সুন্নাহ।

হে আল্লহর বান্দাগন! আল্লাহর ইবাদাত এবং নাবী (সাঃ) এর সুন্নাহ'র বাস্তাবায়ন ও নেকি অর্জন এবং মুসলিমদের দাওয়াতের জন্য নারী, পুরুষ, ছোট, বড় সকলে ঈদের সলাতে বের হও। কারন ঐ নামাজের স্থানে অনেক পুরষ্কার ও কল্যান নাযিল হয়, এবং কল্যানকর দোয়া সমূহ কবুল হয়। আল্লাহ আমাদের সকলের ভালো আমল গুলো কবুল করুন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا